Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 65 – 74
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

অপরাজিতা দেবীর 'বুকের বীণা' : বঞ্চিতের ব্যাথার গান

ফটিক চন্দ্র অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ
Email ID : fatiktfg@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Radharani, Aparajita, College Boarding, Diner Suru, Badal Bilash, Sakhi Sangame, Barshay Bandhabir Chiti, Sesh Ratri, Kaiphiyat.

Abstract
When Radharani Devi was an established name in the Bengali literary world, Aparajita Devi appeared in the Bengali literary world and became widely acclaimed as a poet. At that time, various kinds of debates started in the Bengali literary world about the appearance of Aparajita Devi. Aparajita Devi was considered by many to be Saratchandra's pseudonym. Some also considered Aparajita Devi as a pseudonym of the five poets, meaning a-pa-ra-ji-ta. Under the name of Aparajita Devi, Radharani Devi wrote a total of four poems 'Buker Veena' (1337), 'Anginar Phul' (1340), 'Purabasini' (1342) and 'Vichitrarupini' (1343). In total Fifty three poems in her poems, he has mentioned society and family life through sharp observation, family life and practicality. To say that these poems of Radharani Devi represent the real life of women from women perspective. By looking at men and women in their social and family roles, he was able to clearly relive the reformation and different values of ordinary middle-class life. Her second book of poetry 'Buker Veena' was published in 1930 AD, a year before Radharani Devi's marriage. Booker Veena, a collection of thirteen poems, was her first book of poetry published under the pseudonym 'Aparajita Devi'. Analyzing the total thirteen poems of 'Bukker Veena' Kavya from the point of view of content, two clear categories can be seen in these poems. One is the wonderful juxtaposition of the couple's mutual respect and tears over the child. The other is a picture of the changing color of the universe in terms of family life. In the poem 'birthday', not only the soul story of a young girl named 'Ila', but also the poet's own indomitable aspirations are presented here. The subject matter of the poem 'Day's Beginning' on the one hand is about conjugal relations, on the other hand, the intense love affair of a newly married couple is described in the voice of a newlywed woman. Aparajita Devi's six-stanza poem 'Nishith Kalah' captures the grievances, passions, and pride of the middle-class housewife in its main theme. The subject of the poem 'Badalbilas' is a picture of a wife living on a rainy day. In the poem "Letter from girlfriend in rainy season" a picture of a Middle class house comes up while replying to Ranudi's letter. In the subject of the poem 'Madhyastha' and 'Shesherratri', sometimes pride, sometimes emotional tone for waiting has been sounded. The last poem of the 'Booker Veena'

poem is 'Kaifiyat'. In the content of ther poem, through the character of 'Runu', poet Radharani Devi's personal life tension has come up. In many poems of her poetry such as 'Nishith Kalah', 'Sandhir Sutra', 'Madhyastha', 'Sesh Ratri', 'Varsha Bandhavi's Letter', 'Kaifiyat' etc, he has introduced realism through the use of irony and humor instead of tears. In all the poems of Aparajita Devi we find middle class civic consciousness.

Discussion

কবি রাধারাণী দত্ত বা রাধারাণী দেবী যখন বাংলা সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত নাম তখন বাংলা সাহিত্যে অপরাজিতা দেবীর আবির্ভাব ঘটে। সেই সময়ে কবি হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসিত ও আলোচিত হন তিনি। এই অপরাজিতা দেবীর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে একটা বিশেষ ঘটনা। আশ্চর্যের ব্যাপার অপরাজিতা দেবীর পরিচয় নিয়ে সে সময়ে সাহিত্য জগতে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়, কেউ কেউ শরৎচন্দ্রের ছদ্মনামে লেখা বলে মনে করতেন। অনেকে অ-প-রা-জি-তা অর্থে পাঁচজন লেখকের অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে লেখা বলেও মনে করতেন। সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিতা কবিকন্যা নবনীতা দেবসেন 'রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে লিখছেন –

> "রাধারাণী ও অপরাজিতা পৃথকভাবে সংকলিত হলেন। কেননা কবি স্বয়ং দুটি ব্যক্তিত্বকে সযত্নে আলাদা করে রেখেছিলেন শুধু কাব্যলক্ষণেই নয়, হস্তাক্ষরে পর্যন্ত। সেই হস্তলিপি এতই আলাদা, যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে অপরাজিতাকে উৎসাহ দিয়ে একের পর এক পত্র লিখেছেন রাধারাণীর ঠিকানায়।"[১]

এমনকি যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের লেখা 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থেও রাধারাণী দেবী ও অপরাজিতা দেবী দু-জন পৃথক কবি বলে স্বতন্ত্র ভাবেই আলোচিত হয়েছেন।

রাধারাণী দেবী পরবর্তী কালে এ বিষয়ে নিজে আলোকপাত করেন, দীর্ঘ ১২ বছর অপরাজিতা দেবী নামে লেখার পর তিনি অপরাজিতা নামে লেখার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নেপথ্য কাহিনীটি রহস্য গল্পের মতোই। সম্ভবত এক বছরও হয়নি রাধারাণী দেবীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লীলাকমল' বেরিয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর চায়ের মজলিশে মহিলাদের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী একটি কঠোর মন্তব্য করেছিলেন, 'মেয়েদের কোনো নিজস্ব ভাষা নেই, তারা শুধু পুরুষদের অনুকরণে লেখে' কথাটা রাধারাণী দেবীকে গভীরভাবে বিদ্ধ করে। এই কথাটিকেই তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে দীর্ঘ বারো বছরের জন্য 'অপরাজিতা' নামে এক কাল্পনিক চরিত্রের আশ্রয়ে চলে গেলেন। শুরু হয়ে গেল রাধারাণীর নতুন এক্সপেরিমেন্ট নারীর চোখে দেখা অন্তরঙ্গ সংসারচিত্র নারীর বয়ানে। দৃষ্টিকোণ বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় কল্পনা, আঙ্গিক এবং কৌতুক-কটাক্ষ-কণ্টকিত ভাষা ও ছন্দের নতুন চাল বাংলা সাহিত্য এক নতুন স্বাদের চমক এনে দিল। কাল্পনিক অপরাজিতা চরিত্রের নিপুন অভিনয় ভালোই জমেছিল সেদিন। সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসের সেই আলোড়িত পৃষ্ঠার জীবন্ত নায়িকা অপরাজিতা দেবী আধুনিককালের চোখে বিস্মৃতা এবং প্রয়াতা হলেও তিরিশের দশকের গোড়ায় এবং সেই দশকব্যাপী তিনি ছিলেন বহু নিন্দিত, অভিনন্দিত এবং অনুকৃত এক নতুন রীতির পথিকৃৎ। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ছদ্মবেশী নারী বিদ্রোহের সূচনা, এদেশে ফেমিনিস্ট আন্দোলনের মুখবন্ধ বোধ হয় সর্বপ্রথম তিনিই রচনা করে গিয়েছিলেন আজ থেকে সেই পঞ্চাশ বছর আগে।

তাঁর কবিতায় ঘরোয়া কথাবার্তা, সাদামাটা শব্দ চয়ন তাছাড়া পয়ারের মাপ মেপে নিয়েও ছড়ায় ছন্দের ঝিলিক সকল পাঠককে আকর্ষিত করেছিল। আমদের সংসারের দৈনন্দিনতার মধ্যে যে হাসিকান্নার কৌতুকের ফুলঝুরি সেই ফুলঝুরিকে কাব্যে সাজানো, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তদের ঘরোয়া সমস্যা ও বিষয় নিয়ে অপরাজিতা দেবীর কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। তিরিশের দশকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের বাঙালীর অন্দরের চিত্র এই কবিতাগুলিতে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসের সেই আলোড়িত দিনগুলির নেপথ্যচারিণী অপরাজিতা দেবী আধুনিককালের চোখে বিস্তৃতা ও প্রয়াতা হলেও তিরিশের দশকে শুরুতে ও সেই দশকব্যাপী তিনি ছিলেন বহু নিন্দিতা, বহু আলোচিতা, বহু অভিনন্দিতা ও অননুকৃতা এক ব্যতিক্রমী মহিলা সাহিত্যিক। বলা যায় বঙ্গভূমির সাহিত্যজগতে এ যুগের নতুন নারীবাদী আন্দোলনের মুখবন্ধ বা ভূমিকা তিনিই রচনা করেছিলেন।

এ কথাও বলা প্রয়োজন যে সাহিত্যের এই চরিত্র বদল কোন আকস্মিক বা সাময়িক ঘটনা নয়। রাধারাণী দেবীর সমগ্র জীবন ও স্বভাবের মধ্যেই এই দ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব ছিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিধবা হওয়া একটি বালিকা তার দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে রাজি হয়নি, ভাগ্য পরীক্ষায় সে বদ্ধ পরিকর ছিল। পরিবারের সচেতন সম্ভ্রম ও মমতার আড়ালে প্রবাহিত করুণা ও কৃপার মধ্যে নিহিত অপমান তাঁকে স্পর্শ করে ফেলেছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, উপার্জনা ক্ষমতা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিছুই তাঁর তখন ছিল না। তখন তাঁর হাতে ছিল কেবল একটি ঈশ্বর দত্ত চাবি প্রতিভা, যুক্তি ও জেদ, যা দিয়ে তিনি বহির্বিশ্বে দাঁড়ানোর সাহস সংগ্রহ করছিলেন। সেই বিচিত্র হৃদয়ভাবনা ও অভিজ্ঞতার উপলব্ধিকে জীবনরসে জারিত করেই রক্ষনশীল সমাজের বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা করার সাহস অর্জন করেছিলেন তিনি। কবি নরেন্দ্র দেবকে বিবাহ করে তিনি তাঁর দুঃসাহসীক সততা ও প্রেমের একনিষ্ঠ মূল্যবোধকে প্রমাণিত করেছিলেন নতুন করে। অপরাজিতা নামের আড়ালে তাঁর এই আকস্মিক আত্মগোপন ও সেই অজ্ঞাতবাসকে একটানা বারো বছর চালিয়ে যাওয়া নেহাতই একটা চ্যালেঞ্জের ফসল ছিল সেই সময়ে। এর পেছনে আরও একটি কারণ ছিল, ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাধারাণী দেবীর কাছে আহুত এক প্রীতি সভায় অভিনন্দনের উত্তরে লেখিকা বলেছেন 'সাহিত্য ঠিক দেখতে পাওয়া, বলতে পারা আর ঠিক জায়গায় থামা- তিনটি জিনিসই সমান কঠিন।' কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ন। কলমের ও জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়ার পর আত্মসংবরণের চেষ্টা যে কোন সফল ও উচ্চমানের সাহিত্যিকের একটি বড় গুণ, নতুন সাহিত্য জীবন, তথা সুখী দাম্পত্য জীবন, তাঁকে এতটাই আবিষ্ট ও সুখী করে রেখেছিল যে তিনি সেচ্ছায় অন্তরীণ হয়েছিলেন। কবিকন্যা অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেনের তাঁর নিজের মায়ের সম্পর্কে এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,

> "আমার মা রাধারাণী দেবীকে আমি দেখেছি সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে। যশোশ্রী দিব্যমান স্বামী ও অনুগত সন্তান সমেত সুচারু একটি সংসার জীবনে সম্পূর্ন, আপন মননশীলতার গুণে সুধীমণ্ডলে সম্মানিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ব্যক্তিত্ব, যাঁর প্রতিটি কথার মূল্য আছে, যাঁর পদ-চয়নে আত্মবিশ্বাস ঝলসে ওঠে।"[২]

অপরাজিতা দেবী নামে রাধারাণী দেবীর সর্বমোট চারটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে 'বুকের বীণা' (১৩৩৭), 'আঙিনার ফুল' (১৩৪০) 'পুরবাসিনী' (১৩৪২) এবং 'বিচিত্ররূপিনী' (১৩৪৩)। তাঁর কবিতায় যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষন ও বাস্তবমুখীনতা, তার প্রধান বিষয় হল নারীর পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সংসারজীবন। বলতে গেলে নারীর চোখে দেখা নারীর জীবন। সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকায় নারী নিজেকে ও পুরুষকে দেখতে গিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের সংস্কার ও মূল্যবোধগুলিকে পরিষ্কার করে দেখতে পেয়েছে।

অসংখ্য চরিত্রের মুখচ্ছবি ও সামাজিক রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে তিনি ব্যবহার করেছেন সহজ, সরল মুখের ভাষা। ড্রামাটিক মনোলগের বা নাটকীয় সংলাপের সঙ্গে তাৎক্ষণিকতাকে যুক্ত করে একদিকে লিরিক কবিতার নাট্যধর্মী ডিটাচমেন্ট ভেঙেছেন, অন্যদিকে অ্যান্টিরোমান্টিক অভিঘাত দিয়ে কবি কল্পনাকে বাস্তবভূমিতে দাঁড় করিয়েছেন। অপরাজিতার কবিতা প্রচন্ড জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ তাঁর কাব্যের বইয়ের দ্রুত নিঃশোষিত সংস্করণ। এ ছাড়াও তৎকালীন নানা সাহিত্যের আড্ডায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার সে যুগের কিছু রক্ষনশীল মানুষ কবিতাগুলির মধ্যে শালীনতার অভাবও লক্ষ্য করেছিলেন। আনন্দ বাগচী এ বিষয়ে লিখছেন –

> "শরৎচন্দ্র অপরাজিতার কবিতাকে অশ্লীল বলেছিলেন। সে যুগের বেশ কিছু রক্ষনশীল মানুষ কবিতাগুলির মধ্যে স্ত্রীসুলভ শালীনতার অভাব লক্ষ্য করলেও রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর প্রমুখ সাহিত্যরসিক কিন্তু অভিনন্দনই জানিয়েছিলেন সেদিন। এই ধরনের কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ 'সোসাইটি ভার্সেস' আখ্যা দিয়ে একটা কথা অকপটে অপরাজিতাকে জানিয়েছিলেন, 'এদের নৈপুণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প'। রাধারানীও জানতেন সে কথা। তাই আয়ু ক্ষয় হবার অনেক আগেই তিনি সাহিত্যের বাজার থেকে অপরাজিতার খাতা তুলে নিয়েছিলেন নির্মম হাতে। কিন্তু কবিতা হিসেবে এই কাব্যগ্রন্থগুলির স্থায়িত্ব যাই হোক এর অন্য মূল্য অঙ্গীকার করার উপায় নেই।"[৩]

কিন্তু যশোশ্রী ও প্রতিষ্ঠিত সমকালীন শিল্পী ও সাহিত্যিকরা অপরাজিতা দেবীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে এর সঙ্গে এ ধরনের রচনার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। অপরাজিতা জানতেন সে কথা। তাই 'বিচিত্ররূপিনী'র সংস্করণ নতুন করে প্রকাশ হবার আগেই তিনি সাহিত্যের বাজার থেকে 'অপরাজিতার খাতা' তুলে

নিয়েছিলেন। কিন্তু কবিতা হিসেবে এর মূল্য যতই কম হোক না কেন ব্যঞ্জনা বা গভীরতা না থাকলেও এর অন্য মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কবিতাগুলি পঞ্চাশ ষাট বছর আগের ঘরোয়া ছবিই শুধু নয়, জীবনযাপনের তথ্য হিসেবেও এর গুরুত্ব কম নয়, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সামাজিক বিবর্তনের অনেক ইঙ্গিত, হারিয়ে যাওয়া অনেক সম্পর্ক ও বিস্তৃত প্রায় বহু উদাহরণ এর মধ্যে বিদ্যমান। আর ছন্দের ব্যবহার নমনীয় গতিশীলতার নজর এড়িয়ে যায় না। যথাযথ ভাবে ভাব প্রকাশ করতে প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারেও কবির নৈপুণ্য অসাধারণ, তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি মেয়েদের নিজস্ব সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার প্রথম এবং এখন পর্যন্ত পথিকৃৎ হিসেবে অপরাজিতার কবিতা আজও অভিনন্দিত হবে। আরও একটি বিষয় এই যে অপরাজিতার কবিতাই রবীন্দ্রনাথকে দুটি দীর্ঘ কৌতুক-কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেছিল। আর সেদিক থেকে পত্র সাহিত্যের ভাণ্ডারেও দুখানি অন্তরঙ্গ চিঠি আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারের মর্যাদা বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। এ কৃতিত্বও অপরাজিতারই প্রাপ্য।

কবিগুরুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও অপরাজিতা দেবী কোনদিন আত্মপ্রকাশ করেননি। অপরাজিতা দেবীর এই রহস্যময় অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে রাধারাণী দেবী, 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থের লেখককে যে পত্রখানি লেখেন তা অপরাজিতা রহস্য উন্মোচনের সহায়ক। রাধারাণী দেবী বলেছেন,

> "অপরাজিতার ছদ্মনামে নতুন গঠনের কবিতায় হাত দিয়েছি যখন, মনে তখন দুরন্ত আবেগ। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলাম, দ্বাদশ বর্ষ নিজেকে সম্পূর্ন আড়ালে রেখে ছদ্মনামে ও ছদ্ম-পরিচয়ে এই পরীক্ষা করব, রচনা তার শক্তি ও উৎকর্যের দ্বারা যথার্থ মূল্য পেতে পারে কিনা। এই আত্মপরীক্ষায় আমাকে বহু কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বহু দুঃখ সইতে হয়েছে।"[৪]

কিন্তু রাধারাণী দেবীর সবচেয়ে অগ্নিপরীক্ষার দিন এল যখন রবীন্দ্রনাথকে জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলে এলেন যে, অপরাজিতা মেয়ে নয়, পুরুষ। ক্রুদ্ধ কবি রাধারাণী দেবীকে ডেকে পাঠালেন। সেদিনও রাধারাণী দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে কবিকে বললেন, 'অপরাজিতা আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।' এখন আত্মপ্রকাশ করার উপায় তাঁর নেই, তবে অপরাজিতা তাঁর আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হলেই সে নিজেই আপনার সামনে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে আপনাকে প্রণাম করে ধন্য হবে।

রাধারাণী দেবীর এই আত্মগোপনের ক্ষমতা ছিল অসামান্য। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহের পূর্ব থেকেই তিনি অপরাজিতা নামে কবিতা লিখতেন, হাতের লেখাও একেবারে আলাদা করে ফেলেছিলেন। অপরাজিতার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বুকের বীনা' বিবাহের আগেই প্রকাশিত হয়। বিবাহের পরেও কিছুদিন নরেন্দ্র দেব জানতে পারেননি, তাঁর স্ত্রী-ই অপরাজিতা দেবী। একদিন মধ্যরাতে পড়ার ঘরে স্ত্রীর সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর টেবিলে দুই ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা কবিতার খসড়ার অনুলিপি দেখে প্রথম বুঝতে পারেন রাধারাণীই অপরাজিতা। বিস্ময়ের বিষয় নরেন্দ্র দেব গৃহিণীর এই গোপন কথা কোনোদিন কাউকে প্রকাশ করেননি।

অপরাজিতা দেবীর লিখনভঙ্গী লঘু তরল প্রয়াস-বর্জ্জিত। এর কবিতার বিষয়বস্তুতে গুরুত্ব কিংবা গাম্ভীর্য্য না থাকায় ইনি আমাদের মহিলা কবিদের সনাতন রীতিতে যে গজেন্দ্রগামিনীত্বে তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। এই দুই নূতনত্বের দরুন ইনি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক সমাজে আলোড়ন এনেছেন। 'বুকের বীণা' কাব্যগ্রন্থে সর্বমোট ১৩টি কবিতা রয়েছে, জন্মদিনে, কলেজ বোর্ডিং, দিনের সুর, নিশীথ কলহ, বাদল- বিলাস, সন্ধির সূত্র, সখী-সঙ্গমে, বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি, আঁধারে-আলো, দম্পতির দ্বন্দ্ব, মধ্যস্থ, শেষ রাত্রি, কৈফিয়ৎ। বাংলার নারীরচিত কাব্যসাহিত্যে এই পুস্তিকাখানি যুগ পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিয়েছে।

তাঁর কবিতাগুলি সরস এবং মোটেই গতানুগতিক নয়। কবির সাহস এবং কাব্যনৈপুন্য দুই-ই আছে। কয়েকটি কবিতার মধ্যে দু-একটি চরিত্র চিত্রণ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উদাহরনস্বরূপ 'কলেজ বোর্ডিং' নামক কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। নীরা সেনে কলেজে পড়ে, সে বোর্ডিঙে থাকে। বাড়ি থেকে হঠাৎ খবর আসে তার বিয়ে। সবাই বুঝাইতেছে যে, কলেজ রোমান্স শুধু কাব্যেই চলে, বাস্তব জগতে নয় -

> "কান্না কেন লো? ভুলে যাবি সব, মনোমতো পেয়ে পতি।

কবি মুকুলের কোন কথা আর থাকবে না মনে তোর,
ফুল শয়নেই নয়নে মিলাবে কুমারি স্বপন ঘোর।
ছন্দে যে ছায়া পড়েছিল চিতে, যে ছবি কবির গানে
জেগে উঠেছিল কিশোরী মেয়ের কচি কিশলয় প্রাণে,
সব মুছে যাবে ঘুচে যাবে মীরা যেই ভাই পাবি বর,
হয়ত সেদিন আমরাও তোর হয়ে যাব কোন পর।"[৫]

রাধারাণী দেবী অসামান্য প্রতিভা ও রচনা বৈশিষ্ট্যের গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই কবিখ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন। নিতান্ত ঘরোয়া কথা নিয়ে তিনি যে অপূর্ব্ব সাহিত্য রচনা করেছেন তা যথার্থই অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। তাই, মনে হয় তিনি একজন জন্ম-কবি, জাত কবি, নইলে ভাষা, ভাব, ছন্দ ও ব্যঞ্জনার উপর এতখানি দখল সচরাচর নূতন লেখকদের, বিশেষ করে আবার মহিলাকবিদের মধ্যে দেখা যায় না। দুটি নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি ঘটনা, যার মধ্যে সাধারনত আমরা কোনোরকম কাব্যেরই সন্ধান পাই না, শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিশিষ্ট রসানুভূতি তারই ভিতর হতে যে অনাস্বাদিত অমৃত আহরণ করে আমাদের পরিবেশন করেছেন, তা শুধুমাত্র মধুর ও উপভোগ্য নয়, বিস্ময়করও বটে। কারণ তিনি মানবজীবনের এমন একটা দিকের মোহন ছবি এঁকেছেন যা কোনো মহিলা এ পর্যন্ত ছুঁতে পর্যন্ত সাহস করেননি। এর প্রত্যেকটি কবিতা পড়লে রসহীনেরও মন রসাবিষ্ট না হয়ে পারে না। 'বুকের বীণা'র কাব্যসৌন্দর্য্যের ভিতর রচনার যে অভীনবত্ব রয়েছে তা নূতনত্বের সমাবেশ ঘটিছে।

অতি আধুনিক সাহিত্য বলতে আমরা রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যেকেই বুঝবো, সে যুগের অধিকাংশ সাহিত্যই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও ভাবের দ্বারা প্রভাবিত এবং ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে পরিপুষ্ট। কিন্তু এ অনুকরনের ভিতর দিয়েই বাংলা সাহিত্য তার গন্ডীর পরিসর অনেকখানি বিস্তৃত করে তুলেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা সীমার আবেষ্টনে অসীমের ইন্দ্রিয়াতীত স্তুতি শুনেছি, কিন্তু এরূপ অপার্থিব সৌন্দর্য তাঁর পরবর্তী যুগের সাহিত্যে দেখা যায়নি। তাঁর সাধনা উচ্চতর আদর্শবাদের প্রভাবে রূপ লাভ করেছে, কিন্তু পরবর্তী যূগে সৌন্দর্য্যকে ততখানি Abstract কল্পনা করে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়নি। যুগ ও জীবনের ঐক্য স্থাপন করতে গিয়ে সে যুগের সাহিত্যকগণ নেহাৎ তুচ্ছ ঘরোয়া ছোট ছোট হাসিকান্না, মানুষের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ প্রভৃতিকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করে তুলেছেন, জীবনের পরিপূর্ন উপভোগের ইচ্ছার পথে যে বাধাবিঘ্ন, তাকে সমূলে ধ্বংস করে আপনার ভিতর প্রাণের অপর্যাপ্ততা অনুভব করার বাণী শুনিয়েছেন। এই নতুন জয়যাত্রার সঙ্গিনী হয়ে কয়েকজন মহিলা কবিও তাঁদের দানে সাহিত্যেকে শোভিত করেছেন, তাদের মধ্যে রাধারাণী দেবী অন্যতম।

আমাদের দেশের মহিলা কবিদের ভিতর রাধারাণীর পূর্বে তেমন প্রাণখোলা লেখা আর দেখা যায়নি। সমাজের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তাঁরা অত সহজে দাঁড়াতে পারেন নি, যত সহজে পুরুষ পেরেছে। তাঁদের অন্তঃদৃষ্টি একান্ত অন্তঃমুখীন হওয়ায়, বাইরের আবহাওয়ার সাথে সমান তালে পা ফেলে চলতে এঁরা ভয় পান। কিন্তু বর্তমানে নারী প্রগতি যে শক্তি লাভ করেছে, তাতে কেবল তাঁদের কল্পক্ষেত্রের পরিসরই বাড়েনি, তাঁদের চিন্তাধারারও অপূর্ব পরিবর্তন হয়েছে। এতদিন তাঁদের এটুকু হয়নি বলেই গীতিকাব্যে কোন মহিলাকবি তেমন নাম করে উঠতে পারেননি। আবেগের অকুতোভয়তা না থাকলে গীতিকাব্যের পরিপূর্ন বিকাশ হয় না। অতি আধুনিক সাহিত্যে মহিলা কবিদের ভিতর প্রথমেই নাম করতে হয় রাধারাণী দেবীর। তিনিই প্রথম নারীর অন্তঃর্নিহিত সযত্নে-পোষিত প্রেম-কাহিনীকে সমাজের নিষেধকে উপেক্ষা করে রূপ ও ভাষা দিয়েছেন। এত বড়ো সত্যকে গলা টিপে মেরে তিনি আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করেননি। তাঁর কিছুদিন পরেই লেখিকা দুঃসাহসিকা অপরাজিতা দেবী বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের অবতারণা করলেন।

বেশীদিন হয়নি তাঁর 'বুকের বীণ' প্রকাশিত হয়েছে, অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে নিজের আসন করে নিয়েছেন। তাঁর লেখার অভিনব সুর আর বাস্তবতার এতখানি সংযম ও সুষ্ঠতার সহিত প্রকাশ অতিআধুনিক যুগের কম কবির ভিতরই দেখা যায়। 'বুকের বীণ'র কবিতাগুলি রামধনুর বর্ণ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে একটা অন্যতম দিকের প্রকাশ রয়েছে। প্রেমকে যারা পৃথিবীর ধূলার পরশ থেকে বঞ্চিত করে স্বর্গীয় করে তোলেন, অপরাজিতা তাঁদের

মধ্যে অন্যতম একজন। পৃথিবীর মাটির মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ও মানুষের ছোটোখাটো ঘরকন্নার সুখ দুঃখের বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে বিগত জীবনের স্মৃতির পাপড়িগুলি একটি একটি বিকশিত করে তিনি সেখানে পেয়েছেন জীবনের মধুর প্রেমের দান। জীবনের ব্যর্থতা, অভিমান, বিফলতা, বেদনা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে রূপ পেয়েছে তাঁর নারীসুলভ ভাবনা, তাঁর বলার ভিতর এতখানি স্বতঃস্ফূর্ততা, অকপটতা ও গভীরতা আছে যে, এতে তাঁর কবিতা অভিনব গীতিকাব্যোচিত রসে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে, কোথাও বর্ষার কাজল-কালো মেঘের বর্ষণের মন্থরতায় তা আকূল হয়ে উঠেছে, আবার কোথাও নদীর জলে পড়া আলোর মতন পুলক-চঞ্চল হয়ে উঠেছে ঠিক এই ধরনের কবিতা রবীন্দ্রনাথেও নেই। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কথোপকথন কবিতা লিখেছেন সত্য, কিন্তু সেখানেও তাঁর ভাব ও ভাষা গুরুগম্ভীর।

'জন্মদিনে' কবিতায় নায়িকা সাতপাঁচ ভেবে এত করে নিজেকে ও ঘরকে সাজিয়েছে। অনেক দেখেশুনে সমীর সেনের পছন্দসই সেই নীলসাগরের ঢেউয়ের মতন ঘননীল শাড়িখানি পরে তারই প্রতীক্ষা করছে, 'হৃদয় তার দুরুদুরু করে উঠছে' - কি জানি যার জন্য এত আয়োজন সেই যদি না আসে। আসবার আগেই এ সব ভেবে সে আকুল হয়ে পড়েছে-সাতপাঁচ ভেবে অকপটে বল ফেলছে -

"মুখ তুলে আজও পারিনি কখনো দেখে নিতে ভালো করে-
লজ্জায় যেন লাল হয়ে উঠি-চোখাচোখি হলে পরে।
যদি কিছু আজ বলে সে স্পষ্ট! হাতখানি যদি ধরে?
বিহ্বল হয়ে পড়ে তো যাব না? প্রাণ যে কেমন করে।
তার উপহার লেগেছে আমার সবার চাইতে ভালো।
আজকের এই উৎসবে ওগো সেই তো আমার আলো।"[৬]

প্রেমাস্পদের আগমনের প্রতীক্ষা-পীড়নের পূর্বক্ষণে ভয়ার্ত ও আনন্দ হিল্লোলিত নারীহৃদয়ের অপূর্ব্ব আলেখ্য এই কয়েকটি ছত্র।

'কলেজ বোর্ডিং' কবিতাটি বোর্ডিং-নিবাসিনী ছাত্রী-জীবনের হুবহু ছবি উঠে এসেছে। মেয়েরা এখানে কাউকে ভয় করে না, মেয়েদের এক একজনের পরিচয় রীতি অতি সুন্দর -

"চালিয়াৎ উনি ডাকছে তোকেই। যাসনে ওটার ঘরে
দেখতে পারিনে মোটেই ওটাকে, কথা শুনে রাগ ধরে।
কথায় কথায় কোর্টেশন যেন বিদ্যের বুক–শেল্ফ! –
কোচিংয়ের বেলা কিন্তু কখনো কাউকে করে না হেয়!
স্টাইল নিয়েই আছে দিনরাত, রূপের দেমাকে সারা,
দুঃখ কেবল নেই কটা চুল আর নীল-আঁখিতারা।"[৭]

তাছাড়া 'মীরা', 'বেণু' প্রভৃতি কয়েকটি রোমান্টিক মেয়ের চিত্রও সুন্দর হয়েছে এই কবিতায়। কারো মনের ক্যামেরায় কোন ছেলের মুখ আঁকা পড়েছে, কোন ছেলেটার চেহারা কেমন, ইত্যাদি আলোচনা করতে গিয়ে একটা ছেলে সম্বন্ধে একটা মেয়ে বলছে -

"কিন্তু যা হোক-কপালটা ভালো বলতেই হবে ওর,
এমন লাভার মেলে না সহজে, না হলে বরাত জোর।
ভেরি হ্যান্ডসাম্ সুন্দর চেহারা, ফাইন ফিজিক-টল্
থরো আথেলিট! জুড়ি নেই তার! কোথা লাগে নির্মল।
বাপ বড়োলোক প্রকাণ্ড বাড়ি, মোটর দু-তিন থানা।"[৮]

এই আলোচনার ভিতর নারীর সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভুতির ক্ষমতার পরিচয় আছে অথচ কতগুলি ইংরেজী শব্দ এত সহজে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে যে, তা বিজাতীয় ভাষার বলে মোটেই মনে হয় না। এ ছাড়া অন্যান্য কবিতার মধ্যেও ইংরেজী শব্দের প্রচুর ব্যবহার করে কবি বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন।

'দিনের সুর' কবিতাটির মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সোহাগ-লীলার জীবন্ত ছবি হয়ে উঠেছে। সময়ে অসময়ে স্বামীর আদর-সোহাগের দাবী মিটাতে গিয়ে স্ত্রীকে অনেক সময় লজ্জায় পড়তে হয় কিন্তু অভিমানাহতা স্ত্রী স্বামীকে অনেক কিছু বললেও স্বামী-সোহাগকে কখনো অবমাননা করেনি।

'নিশীথ-কলহ' কবিতায় বিভিন্ন কণ্ঠ-বিলাসের সঙ্গে যে নারী-চিত্রের ছবি পাওয়া যায় তা 'Variable as the shade by the light quivering aspen made.' কিন্তু স্বামীর আগমনে তা আবার স্নিগ্ধ হয়েছে-যাকে এতক্ষন পীড়া দিয়েছে তাকে শেষে মুগ্ধ কণ্ঠে আহবান করেছে -

"অভিমানে দ্বার রুধেছিনু! –দূর! ঘুমাবো কেন?
দুষ্টু।— কিছুই বোঝে না যেন।
ওগো করো মাপ! অবুঝের মতো বলেছি যা' তা'-
অভিমানে জ্ঞান হারাইয়ে ঠিক ছিল না মাথা
জানি, জানি, জানি, বলিতে হবে না, পরাগতম।
তোমারি প্রেমেতে মুখরা যে-জন, তাহারে ক্ষম।"[৯]

স্বামী-সোহাগ লাভের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্বরেখায় দাঁড়িয়ে 'দিনের সুর'তেও স্ত্রী বলছে -

"স্পর্ধা তোমার বেড়েছে বড়ো।
ও বোগের আমি শুধু জানি।
দাও ছেড়ে দাও! দোর খোল, যাই।
আটকে রেখো না কাজের বেলা
বোসবো না আমি তোমার চোয়াবে
তবু কি যে করো! কেবলি খেলা।"[১০]

প্রেমের এই নতুন ভঙ্গী দেখে মনে হয় ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নয়, অলীককে; সঙ্গতকে নয়, অসঙ্গতকে আশ্রয় করে থাকে। সুন্দরকে সুন্দর বলে যেন আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় না, ভালবাসার ধনকে ভালবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলায় না, সেই জন্য সত্যকে সত্যকথা দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ঠিক তার বিপরীত পথ অবলম্বন করতে হয় তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক এবং আনন্দকে কলহে পরিণত করতে ইচ্ছা করে। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করতে গেলে অনেক সময় উহাকে উল্টা করে বুঝিতে হয়।

'বাদল-বিলাস' কবিতাটীতে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষার দিনে' কবিতার ছায়াপাত রয়েছে। বর্ষার সজলস্নিগ্ধ দিনটিতে মেঘ-ছায়া-আঁকা শাড়ীটি পরে সিনেমায় যাওয়া ঠিক হয়েছিল, কিন্তু সহসা তেতালার ছাঁদে জুঁই ফুল ফুটেছে দেখে, তাদের আর যাওয়া হলো না। সৌন্দর্য্যের কত বড়ো শক্তি, তা এ কবিতায় অপরাজিতা দেখিয়েছেন, আজ মেঘলা দিনে জগতের চিরন্তন বিরহের সুরে ঐকান্তিকতা অনুভব করার জন্য নায়িকা বলছেন-

"কুলে কুলে ভরা দিঘীর দিঘল বকুল গাছে
এখনো হয়তো সেই দোলনাটি টাঙানো আছে!
যে-কাজরী গান হেথা শুনিবারে
কতো অনুনয় করেছো আমারে,
ঝিল্লিমুখর পল্লী-প্রদোষে আপনি সে গান শুনাবো নিতি,
দোলায় দুলিব, ভুলিব ভূবন, গাবো গুঞ্জরি ঝুলন-গীতি!"[১১]

'সখী-সঙ্গম' কবিতাটিতে সোহাগ বঞ্চিতা এক প্রেমিকার ক্ষুব্ধ নিবেদনের কথা রয়েছে। শ্রাবণ মেঘের মৃদঙ্গ যেদিন সবার প্রাণে মিলনের রাগিণী জাগিয়ে তুলেছে, নদীর ওপার দিয়ে যখন মেঘের তলে ঝালর বুনো হাঁসের দল চলছে, তখনো কিনা তার প্রেমিক সে সম্পর্কে উদাসীন, এ লোকটিই একদিন তাকে কত করে ভালবেসেছিলো, আজ তার এমনি ধারা দেখ প্রেমিকা বলছে-

"পুরুষ জাতের স্বভাব জানিস? - হঠাৎ প্রমোচ্ছ্বাসে
দুকুল ভাঙা জোয়ার ভুলে ব্যাকুল বেগে আসে।
তার পরেতেই ভাঁটার ভানে শুকিয়ে ওঠে বুক,
রাতের মালা সকাল বেলা খুলতে সমুৎসুক।
সেই কদিনই প্রেমটা ওর নেহাত চলে মেনে,
যদ্দিনে সই, গাঁটছাড়া না শেষ দাঁড়ি দেয় টেনে।"[১২]

অভিমানাহত নারীর এ ক্ষুব্ধ নিবেদনে আত্মজীবনের অতৃপ্তির কাহিনী অতি মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

'বর্ষার বান্ধবীর চিঠি' দুটি মেয়ে-জীবনের বৈপরীত্যের নিখুঁত চিত্র কবি রাণুর জীবনের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। রাণুর জীবন এখন-

"ভিজে ঘটে দিয়ে উনুন ধরানো বলে বোঝবার নয়!
তাও আজকাল কতোদাম জানো? পয়সা খান ছয়!
রান্না চাপাতে দেরি হয়ে যায়, আপিসের ভাত লেট
আধ-খাওয়া করে নিত্য ছোটেন, নইলে চলে না পেট।"[১৩]

কিন্তু রাণুর জীবনে কোনো রোমান্স নেই, তাঁর 'অমুক বাবু'র দাঁতের গোড়ায় ব্যথা, ছেলেপিলেগুলি রোগে ভুগে কাবু হয়ে গেছে, সর্দি কাশি তো লেগেই আছে, কলতলা শ্যাওলায় পিচ্ছিল হয়েছে, ভিজে খুঁটে দিয়ে তাকে রান্না করতে হয়, স্নান করে এসে তাঁর চুল শুকোয় না, তাই তার গলাব্যথা হয়েছে, 'নুনের কোউঠোটা রসে হয়ে গেছে লবন-হ্রদের তরী', 'কোলের ছোট ছেলেটার কাঁথা শুকোয় না দিনে রাতে।' কর্মবহুল বাস্তবজীবনের চিত্রের সঙ্গে কবি ভাববিলাসময় জীবনের কী অদ্ভুদ বিভেদ এই কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

'আঁধারে-আলো' কবিতায় স্বামীর আব্দারের মাত্রা অতিমাত্রায় বাস্তব। বহুদিন ধরে বলে স্ত্রী হয়রান হয়ে গেছে, 'জিনিষ তো আর তেম কিছু না- 'দেড় গজ কারপেট' ও 'দু পেটে উল'-এ আর আনা হয়ে উঠে না, কাজেই স্ত্রী অভিমান করে 'গোপালনগর' (বাপের বাড়ী) চলে যাওয়াই প্রশস্ত মনে করেছে। এমন সময়ে তার ফরমাস্ রুজু হয়েছে। তখন, এক নিমিষের মধ্যে তার রাগ কোথায় চলে গেলো, কত যেন সোহাগের সুরে সে বলতে লাগালো-

"তাই আজ দেরী হোলো ফিরতে তোমার?
সত্যি? এনেছো? - বলো, গা ছুঁয়ে আমার
কী মিথ্যা কথা তুমি কইতে যে পার।
দেখি দেখি, দাও-বাহ! -উঃ ছাড়ো ছাড়ো-
সুড়সুড়ি লাগে বড়ো, ছাড়ো পড়ি পায়।
কাতুকুতু দিয়ো না গো! - দোহাই তোমায়।
বেজায় জুলুম বাপু। এই নাও হল? ...
যাও, ভারি দুষ্টু হু!... ঘরে যাই চলো।"[১৪]

'দম্পতির দ্বন্দ্ব' কবিতার মধ্যে স্ত্রীর পত্রে রুণু প্রণয়-বিবাহের বিষময় ফল প্রকাশ করছে। বিবাহের ফলে সে জনক-জননীর স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়েছে, ভগিনী ও বন্ধু-প্রীতি অনেকদিন তার কাছে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু লাঞ্চনা-গঞ্জনাময় দুর্বিসহ জীবনের সর্বরিক্ততার ভিতর সে যে পরম কৌস্তভ-রতন পেয়েছে, তাকেই লক্ষ্য করে বলছে -

"আমার এ ব্যাথা তোমার মর্মভলে
জেগে ওঠে যেন এমনি অশ্রুজলে।
সেদিন বুঝিবে কি জ্বালা রুনুর বুকে
জ্বলে উঠে তার পোড়ানো সকল সুখে
ভালবাসা বোন। দুঃখ-দহন-শিখা-
তবু সে নারীর জীবনের জয়টীকা।"[১৫]

'মধ্যস্ত' কবিতায় সাত মাসের খোকনকে সাক্ষী করে, স্বামীর ব্যবহারের প্রতিবাদ অতি সূচিত্রিত। বলার ভঙ্গীর সহজতা ও স্বাভাবিকতা একে আরো সুন্দর করেছে। খোকনের আধ আধ কথার সুরে কত সুন্দর মানিয়েছে এই কয়টা কথা -

"ঢের শুনেছি ও সব কথা-নতুন কিছু নয়-
এখন তুমি এ ঘর থেকে নড়লে ভালো হয়,
বড্ড গরম। মাথার কাপড় খুলবে এবার মা,
কেমনতরো ভদ্র তুমি?... বাইরে সরো না-
এই ঘরেতেই আমরা দুজন দিব্যি দেবো ঘুম
চাইনে তোমার খাট-বিছানা-লাইট ফ্যানের ধুম।"[১৬]

'শেষরাত্রি' কবিতাটি বিদায়ের বিষণ্নসুরে বিধুর অথচ ওর অনুভূতির তীক্ষ্নতা আনন্দজনক। নায়িকার প্রেমাস্পদ কালকেই অনেক যোজন দূরে চলে যাবেন, তাই তার কাছে প্রেমিকার একমাত্র অনুরোধ-

"হাতটি বাড়ালে পাবে না পরশ, আসিবে না কানে স্বর
দেখিতে পাবো না সারাদিন রাত্তি, শূন্য রবে এ ঘর।
ভাবিতেও আজ ভয় করে ওগো! আসিলে রাত্রি, কান
আমার প্রহর কাটিবে কেমনে! ছিঁড়িবে স্বপ্নজাল!
শুধু বিচ্ছেদবেদনা সৃজিবে সকাতর অভিমান,
ওগো কাল রাতে এমন সময়ে ভেঙেচুরে দুটি প্রাণ!"[১৭]

কিন্তু এ বলেও তার শান্তি নেই, যার জন্য সে কলঙ্ককে চন্দন মনে করে গ্রহন করেছে, লোকলজ্জায় ভিত না হয়ে যাকে সে ভালোবেসেছে, কী করে সে তাকে ছেড়ে থাকবে? আজ রাত্রেই মরণের স্পর্শে তাদের মিলন-রাখী অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হোক, এই তার কামনা, তাই সে বলছে-

"কলঙ্ক আজ চন্দন মোর, নিন্দা হয়েছে ফুল,
মনুর সমাজে কুলোয়নি ঠাঁই, ভেঙেছে স্বজন-কুল।
সব ছাড়া যায় তোমারি জন্য, তোমারেই ছাড়া দায়।
আমার ভুবন শুধু তোমাময়, ছেয়ে প্রাণ-মন- কায়
ওকি! না না, এসো আরেকটু শোও ভোর হল সবে এই!
আমার মরণ এ সময়ে এলে তার বড় সুখ নেই।"[১৮]

এ কবিতার মধ্যে যে বিচ্ছেদব্যাথার সকরুণতা তা আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে 'কৈফিয়ৎ' কবিতায়, সেখানে রুণু তার ব্যথাহত জীবনের অধ্যায় কথা প্রকাশ করেছে। নীরুদির কাছে লেখা চিঠিতে আজ সে সবই জানিয়েছে, যে তার 'আত্মার আত্মীয়া, যিনি তাকে সারা-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিভব দান করেছেন, তাকে লাভ করে সে দাগী হয়েছে সত্য, কিন্তু তার এ দাগ চন্দনের ফোঁটার ন্যায় পবিত্র ও আরাধ্যতম কারণ পিতামাতা-স্বজন-বন্ধু-ভাই-বোন-সবই তিনি। তাই রুণু নবজন্মের ভূমিকার নতুন অভ্যুদয়ের দিনে তাকেই লক্ষ্য করে আবার বলেছে-

"জানি অনেকের মরমে হয়তো হেনেছি কঠিন বাজ,
ভাবো না তা বলে ঝোঁকের মাথায় খেয়ালে করেছি কাজ।
আমি যাব ওগো, জন্মে জন্মে, তারই কাছে গেছি ফিরে-
নীরুদি! সবার এ কথা বোলো গো-আমার মাথার কিরে।"[১৯]

'বুকের বীণা' কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রমি কবিতা রয়েছে। তার মধ্যে যেমন, 'শেষ রাত্রি' ও 'কৈফিয়ৎ' অন্যতম। বাকি কবিতাগুলির পাঁপড়ি ইতস্তত ছড়ানো থাকলেও সেগুলিকে আমরা মডার্ণ মেয়েলি ছড়া ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারিনে। কিন্তু সেযুগে কজন মহিলা কবি তাঁর মতো মডার্ণ, তাঁর মতো মেয়েলি, তাঁর মতো নিখুঁৎ তাল ও মিল দিতে সমর্থ হয়েছেন? 'দম্পতীর দ্বন্দ্ব' 'সন্ধির সূত্র' 'বর্ষার বান্ধবীর চিঠি' - প্রত্যেকটি কবিতাই যেন পাকা রচনা, পরম সুখপাঠ্য ও অধুনিক প্রেমের কবিতা হয়েছে। এ গুলিতে একটি স্বাস্থ্যবান মনের রসিকতাপূর্ন

রংমশালের আলো সাংসারিক খুঁটিনাটির উপর ঠিকরে পড়ে বাঙালীর গৃহজীবনকে রঙিন করেছে। রুচিবাতিকগ্রস্থরা এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে স্থলে স্থলে অ-মার্জ্জনার গন্ধ পাবেন। আমরা বলি, মার্জ্জিত হলে সেই জিনিষই ঝকমকে হয় স্বভাবত যা মলিন। সমাজের বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে এতখানি তীব্র প্রতিবাদ, প্রেমের স্বতঃস্ফুর্ত নিবেদনের অন্তরায়ের বিরুদ্ধে এতখানি অভিযান, কোনো মহিলা কবি এ পর্যন্ত করেননি। রাধারাণীর ভিতর মানুষের প্রেমের জন্য বিরহগাথা অস্ফুট সুরেই শুনেছি, কিন্তু অপরাজিতা সত্যি এখানে অপরাজেয়া, তাঁর 'বুকের বীণা'য় বঞ্চিত ব্যথার গানের যে আকুতি, তাতে অধিকাংশ আধুনিক লেখেকর সংবেদনশীলতা জড়িয়ে আছে সত্য, কিন্তু তার বিকৃতি নেই, প্রকাশের ভঙ্গিমা সংযমের বাঁধনে তা সুন্দর হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের নবযুগের প্রভাতে তাঁর এ দান কম নয়, সাহিত্য-সরস্বতীর শ্রীচরণে যারা যতো নির্ম্মাল্য দান করেছেন, তন্মধ্যে অপরাজিতার এ অশ্রু-সজল পুষ্পগুচ্ছ অতীব মনোরম।

Reference :

১. দেবসেন, নবনীতা, 'রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভূমিকা– জগদীশ ভট্টাচার্য, ভাবরি, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৮, 'তোমারে বাসিয়া ভালো যত অপমান' পৃ. ৬

২. সেন, অভিজিৎ (সংকলন), 'রাধারাণী দেবী রচনা সংকলন– ১', ভূমিকা– নবনীতা দেবসেন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ৭

৩. বাগচী, আনন্দ, সাহিত্যের নানারকম, লৌকিক উদ্যান, মানবী সংখ্যা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ. ৫৫-৫৬

৪. দেবসেন, নবনীতা, 'রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভূমিকা-জগদীশ ভট্টাচার্য, ভাবরি, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৮, 'তোমারে বাসিয়া ভালো যত অপমান' পৃ. ১৭

৫. দেবসেন, নবনীতা (সম্পাদনা), 'অপরাজিতা রচনাবলী' দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১২, 'বুকের বীনা', 'কলেজ বোর্ডিং' পৃ. ৪০

৬. ঐ 'জন্মদিনে' পৃ. ৩৭

৭. ঐ 'কলেজ বোর্ডিং' পৃ. ৩৭-৩৮

৮. ঐ 'কলেজ বোর্ডিং' পৃ. ৩৯

৯. ঐ 'নিশিথ কলহ' পৃ. ৪৬

১০. ঐ 'দিনের শুরু' পৃ. ৪১-৪২

১১. ঐ 'বাদল বিলাস' পৃ. ৪৭

১২. ঐ 'সখী-সংগম' পৃ. ৫১

১৩. ঐ 'বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি' পৃ. ৫৩

১৪. ঐ 'আঁধারে আলো' পৃ. ৫৭-৫৮

১৫. ঐ 'দম্পতির দ্বন্দ্ব' পৃ. ৬৩

১৬. ঐ 'মধ্যস্থ' পৃ. ৬৫

১৭. ঐ 'শেষ রাত্রি' পৃ. ৬৬-৬৭

১৮. ঐ 'শেষ রাত্রি' পৃ. ৬৮

১৯. ঐ 'কৈফিয়ৎ' পৃ. ৭০